বদরুদ্দীন উমর

আন্দোলনের গণতান্ত্রিক চরিত্রের কষ্টিপাথর

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ এখন পরিণত হয়েছে এক অপরিহার্য প্রয়োজনে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমাদের মতো পশ্চাৎপদ ও সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল দেশে এক স্থায়ী প্রয়োজন। কিন্তু সারা বিশ্বে এবং আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও দখলদারি যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে এই আন্দোলন সম্প্রসারিত এবং বিকশিত করা ছাড়া কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চিন্তা এখন একেবারেই অসম্ভব।

এই বিদ্যমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখা যাবে, আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা এখন যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ও বেপরোয়াভাবে চলছে এটা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। একে হঠাৎ কোন ব্যাপার মনে করার কারণ নেই। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের উপযুক্ত বিকাশ না হলেও এ দেশে বর্তমান শাসক শ্রেণীর একের পর এক সরকারের আমলে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা ও হস্তক্ষেপ এমন বৃদ্ধি পেয়েছে যাতে কোন ক্ষেত্রই এই তৎপরতা ও হস্তক্ষেপের বাইরে নেই।

আজকের (২৬.৯.০৪) 'আজকের কাগজে' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডগলাস কেনিংয়ের প্রায়-গোপন অবস্থায় রাজশাহী সফরের এক বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, এই মার্কিন সরকারি কর্মকর্তার রাজশাহী সফর সরকারের জানা থাকলেও যেসব নিয়ম-কানুন মেনে চলে একটি দেশে অন্য দেশের সরকারি কোন কর্মকর্তার ঘোরাফেরা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দরকার তার কিছুই এ ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। এমনকি গোয়েন্দা বিভাগের কাছে এই সফরের খবর উচ্চ পর্যায় থেকে দেয়া হলেও স্থানীয় প্রশাসন এ ব্যাপারে অন্ধকারে ছিল। কাজেই উল্লিখিত মার্কিন সরকারি কর্মকর্তা ইচ্ছে মতো ঘোরাঘুরি করে বিভিন্ন মাদ্রাসা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন এবং এসব প্রতিষ্ঠানের কিছু শিক্ষক এবং ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে পৃথক ও একান্তভাবে কথাবার্তা বলেছেন।

একটি দেশের সরকারি কর্মকর্তা অন্য দেশের কোন জায়গা নিশ্চয়ই সফর করতে পারেন। কিন্তু প্রায়-গোপন অবস্থায় যে ধরনের সফর এই মার্কিন কর্মকর্তা করেছেন এবং যেসব দেখা-সাক্ষাৎ যেভাবে করেছেন এর উদ্দেশ্য কি? এরা এভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কেন ঘোরাফেরা করছে? এরা কেন এই সফরের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের এজেন্ট খাড়া করে তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে এবং তাদেরকে হুকুমবরদার হিসেবে ব্যবহার করছে? এসব প্রশ্ন হেলাফেলার ব্যাপার নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দফতর, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, জাতীয় সংসদ এবং প্রচার মাধ্যমেও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা আজ জরুরি হয়েছে। এটা জরুরি হয়েছে শুধু এ কারণে নয় যে, এই সেপ্টেম্বর মাসে ৪ দিনব্যাপী এক মার্কিন কর্মকর্তা সরকারের মাথা ডিঙ্গিয়ে এই দেশের একটা এলাকা চষে বেড়িয়েছেন। এটা আসলে জরুরি হয়েছে এ কারণে যে, এই সফর কোন ব্যতিক্রমী ব্যাপার নয়। এ ধরনের এক-আধটা রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও এর মতো অনেক গোপন সফর বাংলাদেশে মার্কিন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা করছেন। এসবের উদ্দেশ্য হল, এ দেশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণের শিকড় আরও ছড়িয়ে দেয়া। সব কিছু কব্জা করে রাখা।

বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন কেন অপরিহার্য হয়েছে সে বিষয়টি কিছুটা স্পষ্ট করার জন্যই সদ্য সংঘটিত মার্কিন কর্মকর্তার উপরোক্ত সফরের বিষয়টির উল্লেখ করা হল। কিন্তু শুধু এই ধরনের কাজই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে এখন যেভাবে একটা সার্বভৌম শক্তি হিসেবে মাঠে নেমে গেছে তার হাজার রকম নিদর্শন আমরা সংবাদপত্রের পাতায় প্রায় প্রতিদিনই দেখছি। এই দেখার কাজটি সামান্যতম গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য করলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে অপরিহার্যতার কথা ওপরে বলা হয়েছে সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

আজকের বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের কথা বললেই মূলত বুঝতে হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন বললেই বুঝতে হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন। সারা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এটা সত্য। আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতেও এটা সত্য।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলন, যা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হতে বাধ্য, কোন হালকা অথবা 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র মতো ব্যাপার নয়। এটা এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ কারণে খুব জোর দিয়েই বলা চলে যে, সরকার পতন আন্দোলন থেকে শুরু করে এ দেশে কৃষক-শ্রমিকসহ সব ধরনের শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের নামে কোন আন্দোলন প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলন কিনা সেটা যাচাই করার একমাত্র পথ হল, এসব আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্র আছে কিনা সেটা দেখা। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাই হল এখনকার যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চরিত্রের কষ্টিপাথর। এই কষ্টিপাথর দিয়েই বুঝতে হবে, কোন আন্দোলন জনগণের স্বার্থে হচ্ছে অথবা নানা প্রকার ভাঁওতাবাজি কথাবার্তার আড়ালে এগুলোর উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিস্বার্থ, শাসক শ্রেণীর স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ মূলত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ উদ্ধার।

বর্তমান গণবিরোধী শোষক, নির্যাতক ও সাম্রাজ্যবাদের খেদমতগার সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টা বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে করা হচ্ছে। এটা এক স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার, যারা এই আন্দোলন করছে তারা কোন প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তি কিনা, তারা সরকারের পতন ঘটিয়ে কোন গণতান্ত্রিক সরকার বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় কিনা। এই প্রশ্নের মীমাংসা ওপরে উল্লিখিত কষ্টিপাথর দিয়েই করতে হবে। দেখতে হবে, এদের এই আন্দোলনের কোন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চরিত্র আছে কিনা।

আওয়ামী লীগই এখন সরকার পতন আন্দোলনের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তাদের নির্দেশিত ও নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী নানা প্রকার কর্মসূচি কার্যকর করা হচ্ছে। মাইলের পর মাইল হাত ধরাধরি করে মানববন্ধন নামে এমন এক ধরনের কর্মসূচি এখন চালু করা হয়েছে যার থেকে রাজনৈতিকভাবে অথর্ব ব্যাপার আর নেই। এসব মহড়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে প্রকৃত রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে জনগণকে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের আন্দোলন বর্তমান জরুরি ও গুরুতর পরিস্থিতিতে জনগণের বিরুদ্ধে এক ন্যক্কারজনক ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

এ কাজ যারা করছে তারা এর চরিত্র ও পরিণতি ভালভাবেই জানে। জেনে-শুনেই তারা বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ রুদ্ধ করার জন্যই এসব কাজ করছে। এটা যে শুধু আওয়ামী লীগই করছে তাই নয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তাদের সঙ্গে এই তথাকথিত আন্দোলন যুগপৎভাবে করছে বামপন্থী এবং উদারপন্থী নামে পরিচিত কয়েকটি দল। এরা মূলত 'বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' ও 'এগারো দল'-এর শরিক। এদের মধ্যে বাসদ (খালেকুজ্জামান) ব্যতিক্রম হিসেবে বের হয়ে একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান নিলেও অন্যরা আওয়ামী লীগের ছত্রছায়াতেই এ কাজ করছে।

আওয়ামী লীগ কোন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দল তো নয়ই উপরন্তু বিএনপি-জামায়াত-জাতীয় পার্টির মতো তারাও বাংলাদেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার ও হুকুমবরদার। নিজেরা ক্ষমতায় থাকার সময় ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারি ও খেদমতগারি করে অনেক 'চমক' সৃষ্টি করেছে।

বিরোধী দলে থাকার সময়ও তারা একই কাজ যথাসাধ্য করে

চলেছে। বর্তমান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেসব দেশীয় স্বার্থবিরোধী, জনগণের স্বার্থবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করে সাম্রাজ্যবাদের খেদমত করছে সেগুলোর কোনটির বিরুদ্ধেই আজ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করেনি! বিএনপি-জামায়াত জোটের হাজার সমালোচনা তার প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা অনর্গল করে গেলেও এসবের কোন সমালোচনা তারা করে না। তারা মার্কিন খেদমতগারি যে যত বিশ্বস্ততার সঙ্গে করছে, এটাও এর এক নিশ্চিত প্রমাণ।

অন্য একটি বিষয়ও এখানে এই মুহূর্তে উল্লেখযোগ্য। সারা বিশ্বে যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, দখলদারির বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে, দেশের জনগণ যখন তাদের সম্পদ ও জীবিকার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন তখন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব মাত্র কয়েকদিন আগে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে নৈশভোজে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেছেন!

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই পরম মিত্রের সঙ্গে শুধু সরকার পতন আন্দোলন নয়, কোন আন্দোলনেরই কি বিন্দুমাত্র গণতান্ত্রিক চরিত্র থাকা সম্ভব? যেসব 'বামপন্থী' ও 'উদারপন্থী' রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ আওয়ামী লীগের সঙ্গে যৌথ, যুগপৎ অথবা অন্য কোনভাবে আন্দোলন করছে তারা কি প্রকৃতপক্ষে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছে? এ বিষয়টি আজ শুধু এই তথাকথিত বামপন্থী এবং উদারপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীদেরকে যে ভেবে দেখতে হবে তাই নয়, সচেতন জনগণের ব্যাপক অংশকেই আজ এই একই কথা ভেবে দেখতে হবে।

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে জনগণের একটা ভাবনা এই যে, বামপন্থীদের ঐক্য দরকার এবং ঐক্য হলেই দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হবে। এই ধরনের ঢালাও চিন্তা যে সঠিক নয়, সেটা বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও এগারো দলের নানা কার্যকলাপ থেকে প্রতিদিনই স্পষ্ট হচ্ছে। এ কথা এখন বেশ জোর দিয়েই বলা চলে যে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রেখে যেসব বামপন্থী দল আন্দোলনে নামবে তারা জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিপজ্জনকভাবে বিভ্রান্ত করবে এবং বাস্তবত তারা তাই করছে। কাজেই যত ঐক্যবদ্ধভাবে তারা এ কাজ করবে, ঐক্যের মধ্যে যত বেশি দলকে তারা সমবেত করবে ততই দেশের ক্ষতি, জনগণের ক্ষতি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য ততই বিপজ্জনক। কাজেই শুধু বামপন্থীদের ঐক্য দিয়েই কাজ হবে না। কোন লক্ষ্য, কি ধরনের কর্মসূচি, সর্বোপরি তারা প্রকৃতপক্ষে ও কার্যত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কিনা এর ওপরই নির্ভর করবে এসব বামপন্থী ঐক্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহায়ক অথবা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য বিপজ্জনক।

'স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি'র আওয়াজ তুলে এই বামপন্থীরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে নানা প্রকার ঐক্যের কর্মসূচিতে শরিক হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে সরকারি জোট গঠন করা এবং অন্যান্য কারণে আওয়ামী লীগ বর্তমান সরকারকে 'স্বাধীনতা বিপক্ষ শক্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করে তার বিরুদ্ধে অন্যদেরকে নিয়ে জোটবদ্ধ হতে চাইছে এবং হচ্ছে। একথা খুবই ঠিক যে, জামায়াতে ইসলামী ও জামায়াত মার্কা দলগুলো ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী ছিল এবং তারা এখনও দেশের জনগণের স্বার্থ ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অনেক রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র?

১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল? তারা কি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি।

শুধু তাই নয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্ববৃহৎ চক্রান্তকারী এবং তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সর্বপ্রধান শক্তিশালী মিত্র ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সর্বপ্রধান শত্রু। এই চরম শত্রু যদি এখন পরম মিত্রে পরিণত হয় এবং সেই দেশের রাষ্ট্রদূতকে যদি নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয় তাহলে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র শত্রু জামায়াতে ইসলামীকে এখন শরবত খাওয়ানোর অসুবিধা কি? বাস্তবত ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে ও ঠিক পরই সরকার গঠনের সময় আওয়ামী লীগ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে একত্রে শরবতই পান করেছিল! এখন জামায়াতে ইসলামী যেসব অপকর্ম করছে তা নিয়ে তোলপাড় করলেও ভবিষ্যতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ আবারও জামায়াতের সঙ্গে ওই একই শরবত পান করতে পারে, যেভাবে তারা মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে নৈশভোজ সমাধা করছে!

এহেন আওয়ামী লীগই এখন হল 'স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি' জোটের নেতা এবং তার নেতৃত্বেই বাংলাদেশের কতকগুলো কথিত বামপন্থী দল গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছে! বাংলাদেশের জনগণকে ও দেশের স্বাধীনতাকে এই বিপদ থেকে রক্ষার দায়িত্ব প্রকৃত বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী ও বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীদের। এই দায়িত্ব জনগণের সচেতন অংশের এবং সেই সঙ্গে সব শ্রমজীবী জনগণের। বামপন্থীদের ভুয়া ঐক্য নয়, ভুয়া বামপন্থীদের প্রকৃত রাজনৈতিক চরিত্র উদ্ভাবনই আজ হতে হবে বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, অপরিহার্য রাজনৈতিক কর্তব্য। এই কর্তব্য যথাযথভাবে পালনই হল এ দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিকশিত করার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

২৬.৯.২০০৪

জেনারেল এম মুস্তাফিজুর রহমান (অব.) বীর বিক্রম

২১ আগস্টের ঘটনা : কিছু প্রশ্ন

২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সমাবেশে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের লক্ষ্য করে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। একই সময়ে তারা বন্দুকধারীর লক্ষ্যবস্তু হন। তখন আনুমানিক বিকাল ৫টা ২৫ মিনিট। ঘটনার পরপরই একটি সামরিকযান ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। ব্যবহৃত গ্রেনেডগুলো আর্জেস গ্রেনেড হিসেবে পরিচিত। নিক্ষিপ্ত গ্রেনেডগুলোর কয়েকটি ঘটনাস্থলে অবিস্ফোরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এর আগে সন্ত্রাসী বা হামলাকারীরা এ ধরনের গ্রেনেড ব্যবহার করেনি। যশোরের উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান কিংবা গোপালগঞ্জে এর ব্যবহার দেখা যায়নি। যশোরে বিস্ফোরিত বোমার টুকরো সংগ্রহ করা হয়েছিল। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে গোপালগঞ্জে তার নির্ধারিত একটি জনসভার আগে ও পরে সভাস্থলের কাছাকাছি জায়গা থেকে দুটি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়েছিল। এর লক্ষ্যও ছিলেন শেখ হাসিনা। উদীচীর অনুষ্ঠানস্থলে ব্যবহৃত হয় উন্নততর ধরনের এইচ.ই. ৩৬ গ্রেনেড। কোটালীপাড়ায় উদ্ধারকৃত দুটি বোমা ছিল ৭৬ ও ৮০ কেজি ওজনের বিশাল আকৃতির। এগুলো দেশেই তৈরি করা হয়েছিল। যশোরে ব্যবহৃত গ্রেনেড এবং কোটালীপাড়ায় পাওয়া বোমা সংক্রান্ত যাবতীয় রিপোর্ট ও প্রতিবেদন যশোর ক্যান্টনমেন্ট এবং ঢাকার আর্মি হেডকোয়ার্টারে মিলিটারি অপারেশন ডাইরেক্টরেটে পাওয়া যাবে। ওই সব বিস্ফোরক ও বোমা সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত আর্জেস গ্রেনেড ধরনের ছিল না, যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১৯৮১ সাল থেকে ব্যবহার করে আসছে।

২১ আগস্ট আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের সড়কে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আশপাশের ভবনের ছাদ থেকে দুই ডজনের মতো গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। এগুলোর অন্তত ৪টি বিস্ফোরিত হয়নি। আর্মি হেডকোয়ার্টারের পক্ষ থেকে যেসব বিষয় ব্যাখ্যা করা দরকার তা হচ্ছে :

১. সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি কেন এমন একটি এলাকায় গিয়েছিল, যেখানে পূর্বনির্ধারিত একটি রাজনৈতিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল? আর্মি হেডকোয়ার্টারের মিলিটারি অপারেশন ডাইরেক্টরেটের স্থায়ী আদেশে পূর্বনির্ধারিত জনসভা স্থল, সম্ভাব্য গোলযোগের এলাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও নিউমার্কেট প্রভৃতি এলাকায়

সামরিকযানের চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে পাঠানো গাড়িটি যথার্থ দায়িত্ব পালনের জন্য গিয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সেনাবাহিনী কোন তদন্ত করেছে কি? গাড়িতে আরোহী কারা ছিলেন? এতে কোন দায়িত্বশীল অফিসার কিংবা জেসিও/এনসিও ছিলেন কিনা? এর তদন্ত রিপোর্ট কি জনসমক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হবে?

২. এর আগে সন্ত্রাসী বা দুষ্কৃতকারীদের হাতে আর্জেস গ্রেনেড দেখা যায়নি। ১৯৮১ সালে সেকেলে মডেলের এইচ.ই. ৩৬ গ্রেনেড বদল করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে এ ধরনের গ্রেনেড প্রচলন করা হয়। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্টে আর্জেস ধরনের গ্রেনেড উৎপাদনের একটি প্লান্ট চালু করা হয়। সেনাবাহিনী প্রধান এ বিষয়ে এমন কোন অভ্যন্তরীণ তদন্ত পরিচালনা করে দেখেছেন কি যেখানে তার অজ্ঞাতে কিছু ঘটেছে কিনা? যদি তা না করে থাকেন তাহলে দ্রুততার সঙ্গেই তা করা প্রয়োজন।

৩. বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের গোলাবারুদের ভাণ্ডারে অন্তত ৫ লাখ আর্জেস গ্রেনেড রয়েছে। সেনাবাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার থেকে দুষ্কৃতকারীরা ডজন দুই গ্রেনেডের একটি বাক্স চোরাইপথে বের করে আনতে পারে, সেটা একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত ইনভেনট্রি চালানোর কথা কি বলা হয়েছে? আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে কি ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা অবিস্ফোরিত গ্রেনেডের ব্যাচ ও লট নম্বর পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে? যদি তা হয়ে থাকে তাহলে সেটা কি জনসমক্ষে প্রকাশ করা যেতে পারে? সব গ্যারিসন থেকে কি গোয়েন্দা রিপোর্ট এসেছে? এ ধরনের জাতীয় সংকটের সময়ে কোন কিছুই নাকচ করে দেয়া উচিত নয়।

৪. 'কি ও লিভার'সহ অবিস্ফোরিত গ্রেনেড নিরাপদ, যতক্ষণ না এর 'কি' খুলে ফেলে নিক্ষেপ করা হয়। কিছু সময় পর অবিস্ফোরিত গ্রেনেডও নিরাপদ। সেনাবাহিনীর এক্সপ্লোসিভ অর্ডন্যান্স ডিসপোজাল বিশেষজ্ঞ এবং বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল ২১ আগস্ট রাতেই তাড়াহুড়ো করে গ্রেনেডগুলো ধ্বংস করে ফেলে। কার নির্দেশে নিষ্ক্রিয়করণ দল সক্রিয় হয়েছিল এবং কাদের কাছে তারা কর্মসম্পাদনের পর রিপোর্ট দিয়েছিল? বাংলাদেশের সর্বত্রই এ ধরনের বোমা/বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়করণের কাজ সেনাবাহিনী প্রধানের পূর্ব অনুমোদনের পর আর্মি হেডকোয়ার্টারের মিলিটারি অপারেশন ডাইরেক্টরেটের নির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে থাকে। আর্মি হেডকোয়ার্টার কি গ্রেনেডগুলো নিষ্ক্রিয় করার অনুমোদন দিয়েছিল এবং তা দিয়ে থাকলে কার নির্দেশে? যদি পুলিশ সদর দফতর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নির্দেশ কিংবা অনুরোধ এসে থাকে তাহলে কে সেই অনুরোধ করেছিলেন? এ অনুরোধ কি মৌখিক ছিল নাকি লিখিত? কেন প্রশাসন এক্সপ্লোসিভ/বোমা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আর্জেস গ্রেনেডের মতো অপরিহার্য ক্লু ধ্বংস করে ফেলল? সরকারের প্রতি মিলিটারি অপারেশন ডাইরেক্টরেটের পরামর্শ কি ছিল? আর্মি হেডকোয়ার্টার এবং সেনাবাহিনী প্রধানের উচিত হবে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়া।

৫. আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের মাস্টার জেনারেল অর্ডন্যান্স হচ্ছে সরকার, প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহ, পুলিশ ও প্যারামিলিটারির সব এজেন্সির নিয়ন্ত্রণে থাকা স্থলভাগের সব অস্ত্র ও গোলাবারুদের হেফাজতকারী। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এসব অস্ত্রশস্ত্র আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের মাস্টার জেনারেল অব অর্ডন্যান্সের অবগতি ছাড়া আমদানি ও ব্যবহার করা যায় না। সেনাবাহিনী প্রধান কিংবা মাস্টার জেনারেল অব অর্ডন্যান্স ঘটনাস্থলে পাওয়া বুলেট ও বুলেটের খোসা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলেন কি? মার্কসম্যানের ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র কি ক্যালিবারের ছিল? এগুলো কি আমাদের স্পেশাল ফোর্সেস ব্যবহৃত ক্যালিবারের সঙ্গে মেলে? সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্তৃপক্ষ কি বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার ও সৈনিক, যারা সার্ভিসে রয়েছেন কিংবা যারা সদ্য অবসরে গিয়েছেন, তাদের বিষয়ে খোঁজখবর করেছেন?

৬. ২১ আগস্ট সন্ধ্যায় সেনাবাহিনী প্রধানের সামরিক গোয়েন্দা এবং আর্মি নিরাপত্তা ইউনিট, উভয়ের মাধ্যমে ঘটনার বিষয়ে বিফ্রিং পাওয়ার কথা। তারা কী বলেছেন সেটা কি সেনাবাহিনী প্রধান স্মরণ ও প্রকাশ করতে পারেন? পরের দিন ডিজিএফআই ও এনএসআইয়ে যারা পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা রয়েছেন, তারা অবশ্যই তার সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদের মত কি ছিল? তারা কি গোষ্ঠী বা ব্যক্তির প্রতি কোন ইঙ্গিত করেছিলেন?

দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী দেশ-বিদেশে যে মর্যাদা অর্জন করেছে তা ক্ষুণ্ন করা যাবে না– এ বক্তব্যে কারও দ্বিমত নেই। কিন্তু এই বাহিনীরই কিছুসংখ্যক হতাশ ও বিপথগামী সদস্য আমাদের দু'দুজন রাষ্ট্রপতিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, সেটাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এ ধরনের অপরাধের জন্য কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না– এ মনোভাব এখন অতীতের বিষয়। ওই সব ঘটনা গৌরবের কিছু ছিল না। এতে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তির যে ক্ষতি হয়েছিল, তা বরং পুনরুদ্ধার করাটাই জরুরি। জনপ্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের ভেতরের ও বাইরের শত্রুদের মোকাবেলা করেই সেটা করা সম্ভব। রাজনৈতিক নেতাদের দোষারোপ করা সেনাবাহিনীর কাজ হতে পারে না। তাদের কাজ বরং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। দেশ ও সেনাবাহিনীর স্বার্থে সেনাবাহিনী প্রধানের উচিত হবে আত্ম-বিশ্লেষণ করা। আজ বিরোধীদলীয় নেত্রী গ্রেনেড হামলার শিকার হয়েছেন। কাল হয়তো সরকার প্রধান এমন নৃশংস হামলার টার্গেট হবেন। দুর্ভাগ্যজনক যে, সেনাবাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

আমার অনুরোধ, অনুরাগ ও বিরাগের ঊর্ধ্বে উঠে একজন নিষ্ঠাবান কমান্ডার হয়ে উঠুন। সাহসী হয়ে উঠুন এবং সাহসিকতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসুন। ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করুন এবং দেশবাসীর কাছে সবকিছু খুলে বলুন।

এটাই রেওয়াজ যে, বিভিন্ন ঘটনায় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ নয় বরং ব্যাখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। অনুগ্রহ করে আমার এ লেখাটিকে দুর্ভাগ্যজনক, অনাকাঙ্ক্ষিত, হীন উদ্দেশ্যপূর্ণ ও দেশপ্রেম বিবর্জিত ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করবেন না। দেশপ্রেমের প্রশ্ন এলে বলতে পারি, প্রয়োজনের সময়েই তার পরীক্ষা দেয়া হয়েছিল। আরেকটি আগস্ট ট্রাজেডির রহস্য উন্মোচনে সবাই এগিয়ে আসবেন, এটাই আমার প্রত্যাশা।

এম মুস্তাফিজুর রহমান, *সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান*